Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খোদেজা আক্তার

রোলঃ 23090120387

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খোদেজা আক্তার

রোলঃ 23090120387

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খোদেজা আক্তার, আইডিঃ 23090120387 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

খোদেজা আক্তার

(স্বাক্ষর)

খোদেজা আক্তার

আইডিঃ 23090120387

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সূচনাঃ 5

জিহাদের আভিধানিক অর্থ : 5

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা : 6

জিহাদের প্রকার ও স্তর সমূহ: 11

নফসের সাথে জিহাদ: 11

শয়তানের সাথে জিহাদ: 12

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ: 12

যালেম, পাপী ও বিদআতীদের সাথে জিহাদ: 13

ইসলামী শরীয়তে জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত: 14

জিহাদের ফযীলত ও বিধান 21

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস 25

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ 26

জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহার: 33

জিহাদ ফরয আইন এবং বড় ফরয: 36

শহীদের মর্যাদা: 41

উপসংহার: 52

সূচনাঃ

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলে কারীম (সা.) প্রদর্শিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ইসলামই পারে বিশ্ববাসীকে একটি শান্তিময় পরিবেশ উপহার দিতে। ইসলামই পারে মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বৈষম্য, বিভ্রান্তি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে। বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মানবজাতি যখন ছিল ঘূর্ণায়মান ঠিক তখনই সঠিক পথের দিশা ইসলামের আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্বদরবারে হাজির হলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর আনিত এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কোন বিকল্প ছিল না। যিনি আমরণ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজে নিয়োজিত ছিলেন, অথচ তাঁর ইন্তেকালের পর তার উম্মতেরাই এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নিয়ে আজ নানা ধরণের বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে আছে। বিশ্বমুসলিমের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নামে আক্ষায়িত করছে। তাই এই বিভ্রান্তি নিরসনে আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর ফয়সালা আমাদের জানা উচিত। আর ইসলাম ধর্মে এই জিহাদের কী গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে, জিহাদ না করলেই বা সমস্যা কী তা নিজে জানা এবং অপরকে জানানোর জন্যই আজকের এই ক্ষুদ্র আলোচনা।

জিহাদের আভিধানিক অর্থ :

'জিহাদ' শব্দটি 'আরবী 'জাহাদা' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া'। 'আরবদের কাছে শাব্দিকভাবে 'জিহাদ'-এর অর্থ হলো 'কোনো কাজ বা মত প্রকাশ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বা কঠোর সাধনা করা'। তাছাড়াও 'জিহাদ' শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে আরো অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১ اَلْجَدّ ''আল জাদ্দু'' বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা।
২. اَلطَّاقَة ''আত্ব ত্বা-কাতু'' বা কঠোর সাধনা করা।
৩. اَلسَّعْى ''আস্ সা'ইউ'' বা চেষ্টা করা।
৪. اَلْمُشَقَّة ''আল মুশাক্কাতু'' বা কষ্ট বহন করা।
৫. بَذْلُ القُوَّة ''বাযলুল ক্যুওয়াহ্'' বা শক্তি ব্যয় করা।
৬. اَلنِّهايَةُ والغَايَة ''আন্ নিহায়াতু ওয়াল গায়াহ'' বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছা।
৭. اَلْأَرْضُ الصُّلْبَة ''আল আরদুস্ সুলবাহ্'' বা শক্তভূমি।
৮. اَلْكِفَاح ''আল কিফা-হ'' বা সংগ্রাম করা।

মোটকথা, শাব্দিক অর্থে 'জিহাদ'-এর সংজ্ঞা হলো, অন্তত দু'টি পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো।

শাব্দিক অর্থ মোতাবেক, এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সশস্ত্র কিংবা নিরস্ত্র উভয়ই হতে পারে; অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, ব্যয় না করেও হতে পারে। একইভাবে, দু'টো পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যেও পরস্পরকে দমানোর জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হতে পারে। এই জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) কেবল কথার মাধ্যমেও হতে পারে, অথবা কোনো একটি কাজ না করা বা কোনো একটি বিশেষ কথা না বলার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি তার পিতামাতা আদেশ করে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য আর সেই ব্যক্তি যদি পিতামাতার নির্দেশ অমান্য করে ও সবর অবলম্বন করে, তবে তা-ও জিহাদ। আবার কোনো ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তবে তা-ও জিহাদ।

'জিহাদ' শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিমদের জিহাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের প্রবৃত্তি, শায়ত্বন, দখলদার কিংবা কাফির শক্তি। পাশাপাশি, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাদ হতে পারে আল্লাহর পথেও (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ)। তাই এই জিহাদ হতে পারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আবার হতে পারে শায়ত্বনকে খুশি করার জন্যও। যেমন : কাফিরদের জিহাদ হলো শায়ত্বনকে খুশি করার জন্য। কাফির পিতারা তাদের মু'মিন সন্তানদের সত্য বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্য যেসব কাজ করতো, সেগুলোকে কুরআনে জিহাদ বলা হয়েছে :

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

''তোমার পিতামাতা যদি জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক কর যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অমান্য কর।'' (সূরা লুকমান ৩১ : ১৫)

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

হানাফী মাযহাবের আইন গ্রন্থ 'বাদাউস্ সানায়ী'-হতে জানা যায়, জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা। শার'ঈ অর্থে জিহাদ হলো নফস্, অর্থ ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও শক্তি খাটানো।' অপর হানাফী গ্রন্থ شرح الوقاية-এর গ্রন্থকার বলেনঃ

اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْه.ُ

অর্থাৎ جِهَاد হচ্ছে সত্য দ্বীনের প্রতি আহবান করা এবং তা অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শাফি'ঈ মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'আল ইকনা'-তে বলা হয়েছে, 'জিহাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।' আল-শিরাজী তাঁর 'আল মুহাজাব'-এ বলেন, 'জিহাদ হলো ক্বিতাল (যুদ্ধ)'। সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবন হাজার (রহঃ) 'ফাতহুল বারী'-তে বলেন, জিহাদ এর শার'ঈ অর্থ হলো: وَشَرْعًا بَذْل الْجَهْد فِي قِتَال الْكُفَّار অর্থাৎ- ''কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম করা''।

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'মানহুল জালীল'-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -

قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

'আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে করার জন্য কাফিরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই .....।'

হাম্বালী মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'আল মুগনী'-তে ইবনু কুদামাহ্ও ভিন্ন কোনো সংজ্ঞা দেননি। 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে তিনি বলেন, যা কিছুই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা ফরযই 'আইন বা ফরযই কিফায়াহ্ যা-ই হোক না কেন, অথবা এটা মু'মিনদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করা হোক বা সীমান্ত রক্ষা হোক- সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, 'শত্রুরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপর জিহাদ করা ফরযই 'আইন হয়ে যায়। যদি শত্রুদের আগমন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমীরের নির্দেশ ছাড়া সীমান্তরক্ষীরা তাদেরকে মোকাবেলা না করে আসতে পারবে না। কারণ একমাত্র আমীরই যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।'

এছাড়া সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের ব্যবহার :

মক্কায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না, তাই মাক্কী সূরাহ্সমূহে 'জিহাদ' শব্দটি শার'ঈ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: সূরা লুকমানের ১৫নং আয়াত, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ আরো উদাহরণ হলো:

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين﴾

''আর যে ব্যক্তি সাধনা (জিহাদ) করে, সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে। আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।'' (সূরা আল 'আনকাবূত ২৯ : ৬)

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾

''আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমার ওপর চাপ (জিহাদ) দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।'' (সূরা আল 'আন্কাবুত ২৯ : ৮)

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

''আর যারা আমার উদ্দেশে কষ্ট সহ্য (জিহাদ) করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন।'' (সূরা আল 'আন্কাবূত ২৯ : ৬৯)

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

''অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান।'' (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ৫২)

মদীনায় অবতীর্ণ ২৬টি আয়াতে জিহাদের বিষয়টি এসেছে এবং এগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্টভাবে 'যুদ্ধ' (ক্বিতাল) অর্থ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

''সমান নয় সেসব মু'মিন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ওই সব মু'মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়া'দা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর।''

(সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৫)

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম।

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

''তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।''

(সূরা আত্ তওবা্ ৯ : ৪১)

ঐতিহাসিক তাবূক যুদ্ধের সময় প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়। তাবূক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল খেজুর কাটার মৌসুমে। তখন গরমও ছিল খুব বেশি। তাই কেউ কেউ ক্ষেত-খামার, ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে, কেউ পারিবারিক কাজের অজুহাতে, কেউ

বা অসুস্থতার বাহানা তুলে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আল্লাহ তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রার্থনা বাতিল করে দিলেন এবং ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক, খুশি-অখুশি, সশস্ত্র-নিরস্ত্র, ধনী-গরিব সবার জন্য যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ফরয করে দিলেন। এখানে 'জিহাদ' শব্দটি পরিষ্কারভাবে 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

একই অর্থ রয়েছে এই সূরার ৮৮ নম্বর আয়াতে, ''কিন্তু রসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দিয়ে, তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম।'' (সূরা আত্ তওবা্ ৯ : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত শত হাদীসে 'জিহাদ'-কে শার'ঈ অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ সায়িম (রোযাদার), যে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে, যে তার সওম ও সালাত আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ সাওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।

(বুখারী হাঃ ২৭৮৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৭৭)

এ হাদীসে পরিষ্কারভাবেই 'মুজাহিদ' বলতে যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে- যে যোদ্ধা 'যতক্ষণ না ফিরে আসে' ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবসমূহ পেতেই থাকে। অন্য হাদীসে 'আবদুল্লাহ বিন হুবশী বলেন,

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِه وَنَفْسِه قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهَرِيقَ دَمُه وَعُقِرَ جَوَادُه

লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো জিহাদ উত্তম?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়। (আবূ দাঊদ, হাঃ ১৪৫১; নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আরেক হাদীসে ইবনু 'আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَه أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ

যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হলো, আল্লাহ তাদের রূহগুলোকে সবুজ পাখির পেটের ভিতরে ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযক আহরণ করেন, অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর 'আরশের নিচে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের আনন্দ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।' এরই প্রেক্ষিতে সূরা আ-লি 'ইমরান-এ নাযিল হয় :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

''আর যারা আল্লার পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত''- (সূরা আ-লি 'ইমরন ৩ : ১৬৯)। (আবূ দাঊদ, হাঃ ২৫২২)

প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদে মৃত্যুবরণ করা খোদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই একান্ত বাসনা ছিল :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কিছু মু'মিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সবাইকে আমি সওয়ারী দিতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর আবার জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। (বুখারী হাঃ ২৭৯৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৬৭)

৩৭৮৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়িম করবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করবে বা স্বীয় জন্মভূমিতে অবস্থান করে- তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওপর হক ও দায়িত্ব হয়ে যায়। অতঃপর লোকেরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, আমরা কি জনগণের মাঝে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহর পথে

জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ' মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছে। প্রতি দু' শ্রেণীর মর্যাদার মাঝে দূরত্বের পরিমাণ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তখন তার নিকট (জান্নাতুল) ফিরদাওস প্রার্থনা করবে। কেননা তা জান্নাতের মধ্যম ও সর্বোত্তম জান্নাত। তার উপরিভাগে আল্লাহর 'আরশ এবং সেখান থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। (বুখারী)[1]

সুত্র:মিশকাতুল মাসাবিহ (মিশকাত)

জিহাদের প্রকার ও স্তর সমূহ:

উপরোক্ত বিশেস্নষণের পর আমাদের জানা উচিৎ যে, জিহাদের চারটি প্রকার রয়েছে। (১) নফসের সাথে জিহাদ, (২) শয়তানের সাথে জিহাদ, (৩) কাফের ও মুনাফেকদের সাথে জিহাদ এবং (৪) জালেম, গুনাহগার ও বিদআতীদের সাথে জিহাদ।

নফসের সাথে জিহাদ:

নফসের সাথে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে। (১) ইলম, দ্বীনে হক ও হিদায়াতের তালাশের চেষ্টা করা এবং এর উপর নফসকে বাধ্য করা। কারণ দ্বীনে হকের জ্ঞান অর্জন ছাড়া সাফল্য অর্জনের কোন সুযোগ নেই। বান্দা তা অর্জনে ব্যর্থ হলে ইহকাল ও পরকালে সে হতভাগ্য হবে। (২) বান্দা ইলম অর্জন করার পর ইলমকে আমলে পরিণত করবে। কারণ আমল ছাড়া ইলম তার কোন উপকারে আসবেনা। (৩) ইলম ও আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিবে। অজ্ঞদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে। অন্যথায় সে আল্লাহর নাযিলকৃত হিদায়াত ও সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং তার ইলম অন্যের উপকার করলেও তার নিজের কোন উপকার করবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবেনা। (৪) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে যে সমস্ত বিপদ আসে বান্দা তার উপর নফসকে সবর করতে বাধ্য করবে। মানুষেরা তাকে কষ্ট দিলেও সে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে সব কিছুই মাথা পেতে মেনে নিবে। যার ভিতরে এই চারটি গুণ পাওয়া যাবে সে রাববানী তথা আল্লাহর প্রিয় অলী হতে পারবে।

সালাফগণের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন আলেমই ততক্ষণ পর্যন্ত রাববানী হওয়ার যোগ্য হয় না যতক্ষণ না সে সত্যকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়, সে অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। সুতরাং যে শিখল, আমল করল এবং শিক্ষা দিল তাকে উর্ধ্বাকাশে (জান্নাতে) মহা সম্মানের সাথে ডাকা হবে।

শয়তানের সাথে জিহাদ:

শয়তানের সাথে জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে। (১) ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ এবং ওয়াসওয়াসা বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় তা প্রতিহত করার সংগ্রাম করা। (২) শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ কাজের প্রতি যে আগ্রহ ও আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করার সংগ্রামে সদা প্রচেষ্টা চালানো। মজবুত ঈমান ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে প্রথমটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই দ্বিতীয়টির মোকাবেলা করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (সূরা সাজদাহ-৩২: ২৪) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, দৃঢ় বিশ্বাস ও সবরের মাধ্যমেই নের্তৃত্ব পাওয়া যাবে, ধৈর্যই খারাপ নিয়ত ও কুপ্রবৃত্তিকে প্রতিহত করে এবং মজবুত ঈমান সন্দেহ বিদূরিত করে।

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদেরও চারটি স্তর রয়েছে। (১) অন্তরের মাধ্যমে জিহাদ, (২) জবানের মাধ্যমে জিহাদ, (৩) মালের সাহায্যে জিহাদ ও (৪) জান ও হাতের মাধ্যমে জিহাদ। কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে। আর জবানের সাহায্যে জিহাদ করতে হবে মুনাফেকদের সাথে।

যালেম, পাপী ও বিদআতীদের সাথে জিহাদ:

এই প্রকার লোকদের সাথে জিহাদের তিনটি স্তর রয়েছে। (১) ক্ষমতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করতে হবে। (২) হাত দিয়ে করতে অক্ষম হলে জবান দিয়ে করতে হবে। (৩) আর তাতেও অক্ষম হলে অন্তর দিয়ে করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জিহাদের সর্বমোট ১৩টি স্তর খুঁজে পাচ্ছি। নাবী (ﷺ) বলেন-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা নিজের মনের মধ্যে জিহাদের আকাঙ্খা না রেখেই মারা গেল সে নিফাকীর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মারা গেল"।[1]

হিজরত ব্যতীত জিহাদ পূর্ণ হয় না। ঈমান ব্যতীত জিহাদ ও হিজরত উভয়টিই মূল্যহীন। আল্লাহর রহমতকামীগণই এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হয় এবং তা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِى سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়"। (সূরা বাকারা-২:২১৮)

ঈমান আনয়ন করা যেমন প্রতিটি মানুষের উপর ফরয ঠিক তেমনই প্রত্যেক মুমিনের উপর প্রতি মুহূর্তে দু'টি হিজরত করা আবশ্যক। এককভাবে ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর কাছেই আশা-আকাঙ্খা করা, আল্লাহকে ভালবাসা এবং একনিষ্টভাবে তাওবা করার মাধ্যমেই আল্লাহর দিকে হিজরত করতে হবে। আর রসূলের অনুসরণ, তাঁর আদেশের সামনে নত হওয়া, তিনি যেই সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদেশকে অন্যদের আদেশের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে রসূলের দিকে হিজরত করতে হবে। রসূল (ﷺ) বলেন-

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ومَن كانت هِجْرتُهُ إلى دُنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوَّجُهَا فَهِجْرته إلى ما هاجر إليه

"কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (ﷺ) এর উদ্দেশ্যেই হিজরত বলে গণ্য হবে। আর কারো হিজরত যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[2]

ঠিক তেমনই আল্লাহর আনুগত্যে নফসকে বাধ্য রাখতে এবং শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন। এখানে একজন অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত হবে না।

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে উম্মাতের কোন একটি দল এই প্রকারের জিহাদে আঞ্জাম দিলে এবং তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে অন্যদের উপর হতে ফরযিয়াত উঠে যাবে।

ইসলামী শরীয়তে জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত:

'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি।[1] আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে।[2] যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[3] হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[4] আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[5] তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্বহে জিহাদ বলতে "কিতাল" বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।[6]

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেননি বা করার অনুমতি প্রদান করেননি। দুই-একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক নেতা বা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন "কমান্ডো" অভিযান পারিচালনা করার অনুমতি দেন তিনি। কাব ইবনু আশরাফ ও আবূ রাফি সালাম ইবনু আবিল হুকাইক-এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে কমান্ডো অভিযান ছিল এ পর্যায়ের। এরূপ অভিযানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন।[7] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এরূপ কমান্ডো হামলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে যুদ্ধের ময়দান ও বিচার ছাড়া তিনি হত্যার অনুমতি দেন নি। এমনকি

যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

কিতাল বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।

(১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম 'দা'ওয়াত' বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মুকাবিলা করেছেন। আবূ বাকর, উমার, উসমান, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ও মক্কার আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় সামাজিক নেতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সাথে সাধারণ অনেক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إنما الإمامُ جُنةٌ . يُقاتلُ من ورائهِ

"রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৪]

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধ বা কিতালে লিপ্ত হন নি। আলী (রা)-এর সাথে মু'আবিয়া (রা)-এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি

হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা)-এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন, যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে,

إنَّ الناسَ ضَيَّعوا وأنتَ ابنُ عُمَرَ، وصاحبُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما يَمنَعُكَ أن تَخرُجَ ؟ فقال : يَمنَعُني أنَّ الله حَرَّمَ دمَ أخي

وفي رواية: ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت

মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এ-ই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলে, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"[9]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[10] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া জিহাদ আরকানে ইসলামের মত মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট (Aimed at; intended) ইবাদত নয়; বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলি পালনের উপকরণ (accessory; equipment; apparatus) মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদগুলি পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে "জিহাদ" কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন ততবেশি সাওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এজন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার "উপকরণ"। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়।

এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেননি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।[11]

(২) রাষ্ট্র বা মুসলিমের নিরাপত্তা

কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[12] মুসলিম রাষ্ট্রের ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও অন্যদেশের নির্যাতিত মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও জিহাদের প্রয়োজনে হতে পারে। যদি অন্য দেশের মুসলিম নাগরিকগণ কোনো মুসলিম দেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সে দেশের সাথে মুসলিম দেশের কোনো চুক্তি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে বা তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমন এনছে, হিজরত করেছে (অমুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে) এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা একে অপরের অভিভাবক-বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের (সাহায্যের) কোনোরূপ দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এরূপ জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[13]

(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ

আমরা দেখেছি যে, জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের পরিবেশ রক্ষার উপকরণ। জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র, নাগরিক ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ

উদ্দেশ্য যদি জিহাদ ছাড়া অর্জিত হয় তবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[14] হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, দাওয়াতের প্রসার ও দীনের বিজয়ে জিহাদের চেয়েও সন্ধির অবদান ছিল অনেক বেশি। জাগতিক বিচারে এ সন্ধি ছিল অপমানজনক, অবমাননাকর এবং কাফিরদেরকে সকল ছাড় দেওয়া। যে কোনো আবেগী বিচারে এ ছিল "সব কিছু মেনে নেওয়া"। উমার (রা) ও অধিকাংশ সাহাবীই এরূপ ভেবেছেন। এ সময়ে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল অধিকার তাদের ছিল এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাফিরদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। আর ইসলামের কোনো জিহাদ, গাযওয়া, যুদ্ধ, অভিযান বা বিজয়কে "ফাতহ মুবীন" বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয় নি। কিন্তু এ "সব কিছু মেনে নেওয়ার" সন্ধিকে কুরআনে "ফাতহ মুবীন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ধি ও শান্তি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এর একটি প্রকাশ হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার্থে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এ ছিল এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রায় সকল সাহাবীকে বিক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ চুক্তি রক্ষায় অনড় ছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শর্ত মেতাবেক তাকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকেও ফিরিয়ে দেন। একপর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে 'ঈস' নামক স্থানে সমবেত হন। সন্ধিচুক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর মদীনা রাষ্টের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছি। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলির উপর আক্রমন চালাতে থাকেন।

মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্টের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিচুক্তির সংশিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[15]

এভাবে সকল প্রকার আবেগ ও বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধি ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ বা হত্যা এড়িয়ে শান্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শান্তির সুযোগ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া বা কর প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যুদ্ধ চলাকালে একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করারএকান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[16] এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

لا تغدروا ولا تمثلواولا تقتلوا وليداً ولا اصحاب الصوامع ... ولا راهبا ... ولا امرأةً ولا شيخاً كبيراً ... ولا تذبحوا بغيراً ولا بقرةً الا لمأكل ... ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شجرة الا لنفع ...وأحسنوا ان الله يحب المحسنين

"যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে

হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[17]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক (defensive) হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলক (offensive/preemptive) হতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

জিহাদের ফযীলত ও বিধান

নিঃসন্দেহে জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানী দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ এবং মানবীয় প্রকৃতির জন্য খুবই কষ্টকর। এজন্য এ ইবাদতের সাওয়াব ও পুরস্কারও অভাবনীয়। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত সাওয়াব ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জিহাদের ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবে। এছাড়া জিহাদের আবেগ ও আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَن مات ولم يَغزُ ، ولم يحدِّث به نفسَه ، مات علَى شُعبةٍ من نفاقٍ

"যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।"[1] আমরা দেখব যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরয কিফায়া এবং রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ফরয আইন। ফরয কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إذا تبَّايعتم بَّالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بَّالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

“যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুরু লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।”[2] এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে অনেক সময় আবেগী মুমিন ভুল বুঝেন যে, জিহাদের বিষয়ে যেহেতু বেশি বেশি নির্দেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বেশি বেশি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেহেতু জিহাদ সালাত-সিয়ামের মতই ইবাদত অথবা সালাত সিয়ামের চেয়েও বড় ইবাদত। কারণ মহান আল্লাহ সালাত ও সিয়াম ফরয করেছেন এবং তিনিই জিহাদ ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন (كتب عليكم الصيام) তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে”[3] এবং তিনিই বলেছেন (كتب عليكم القتال) তোমাদের উপর কিতাল বা যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে” ।[4] কাজেই সালাত, সিয়াম ও জিহাদ-কিতালের মধ্যে পার্থক্য করলে বা সালাত পালন করে জিহাদ-কিতাল পালন না করলে ইসলাম পালন করা হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সাথে খারিজীগণের কথোপকথনে আমরা এর নমুনা দেখেছি।

ً

“মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।”[7] বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতামাতার খেদমত বা অনুরূপ দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَهُ في الجهادِ فقالَ: أحيٌّ والداكَ ؟ قال: نعَم قال: ففيهِما فجاهِدْ (فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما

“এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমন ও সাহচার্যে জীবন কাটাও।”[8] এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনী যদি রাষ্ট্র দখল

করে নেয়, বা রাষ্ট্র যদি বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেনাবাহিনীর পক্ষে আগ্রাসন রোধ সম্ভব না হয়, এবং রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

" যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।"[9] তাফসীর, হাদীস-ব্যাখ্যা ও ফিকহের প্রায় সকল গ্রন্থেই বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাম। আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। তা এজন্য যে তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। কীভাবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি-অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য মসজিদে হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের কথা আলাদা। যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[1]

এখানে আল্লাহ বলেছেন: "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর ..." অনেক সময় অমুসলিম লেখকগণ এবং কখনো আবেগী মুজাহিদগণ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বাদ দিয়ে এবং এ আয়াতগুলি আগের ও পরের বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, ইসলামে সকল কাফির বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত বাদ দিলেও এখানের আয়াতগুলি খুবই স্পষ্ট। এখানে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে- তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে সকল কবীলা বা গ্রাম রাষ্টের সাথে- তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তার যদি দীন গ্রহণ করে বা

বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমন করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।

এখানে অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেন নি। এখানে মুশরিকগণ বলতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো সে সকল চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা কবীরা রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রথমে, শেষে ও মাঝে বারংবার চুক্তিরক্ষাকারীদের চুক্তি রক্ষা করতে ও নিরাপত্তাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাকি সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতর্কিত বা গোপন আক্রমন না করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

এ ঘোষণার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বেশি জিহাদ করে বেশি মুশরিক হত্যা করা নয়, বরং এ ঘোষণার উদ্দেশ্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষকে বাঁচানো। আধুনিক যুগেও আগ্রহী অযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বা যুদ্ধরত রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মনোবল দুর্বল করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। যে কোনো আন্তর্জাতিক ও মানবিক বিচারে যুদ্ধের জন্য এর চেয়ে মানবিক ও যৌক্তিক ঘোষনা হতে পারে না। আমরা পরে দেখব যে, বাইবেলীয় জিহাদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নৈতিকতা রক্ষা করা হয় নি; বরং যে কোনোভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শত্রু হত্যাই সেখানে মূল লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়েছে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, কাফির-মুশরিককে হত্যার নির্দেশের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফির যোদ্ধা হত্যা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই বিচারে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত 'কাফির' ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেননি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেননি বা হত্যার অনুমতি দেন নি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেন নি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ''যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম

নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।''

আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে যখন যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে সাহাবীগণ কখনোই ঢালাওভাবে ''খারিজী'' মতাবলম্বীদের যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করার অনুমতি বুঝেন নি। বরং এ থেকে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে খারিজী যোদ্ধাদেরকে হত্যার নির্দেশনা বুঝেছেন। খারিজীগণ অযোদ্ধা সাহাবী-তাবিয়ীগণ বা সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করলেও সাহাবীগণ কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনোভাবে খারিজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি বা তাদেরকে হত্যা করেননি। সমাজে তারা খারিজীদের সাথেএকত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন।[2]

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাই, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উলিখিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত কয়েকটি বিভ্রান্ত দল ছাড়া কেউ জড়িত হন নি। পরবর্তীকালের দুটি 'জিহাদ' আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: (১) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮১৮-১৮৩১খৃ) ভারতে বৃটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও (২) আফগান জিহাদ। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ভারতের ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতা প্রমাণ করেন।

আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এ জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এ জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের

সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ

উপরে আমরা ইসলামী শরীয়তে জিহাদের পরিচয়, তার উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা জানি যে, ইসলাম বিরোধী সকল প্রচারণার মূল দাবি যে, ইসলামই ধর্মের নামে যুদ্ধ বৈধ করেছে। বিশেষত খৃস্টান ধর্মগুরুগণ খৃস্টধর্মকে ''ভালবাসা ও মানবতার ধর্ম'' ও ইসলামকে যুদ্ধ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ধর্ম বলে চিত্রিত করেন। ইউরোপে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সন্ত্রাসী রূপে চিত্রিত করে কার্টুন ছাপা হচ্ছে এবং ''কুরআন''-কে সন্ত্রাসী গ্রন্থ বলে দাবি করে তা নিষিদ্ধ করতে দাবি জানানো হচ্ছে। ক্যাথলিক খৃস্টান জগতের বর্তমান ধর্মগুরু পোপ ১৬শ বেনিডিক্ট (Benedict XVI) ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির রিগেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় বাইজানটাইন সম্রাট ম্যানুয়েল-২ এর ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "Show me just what Mhuammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached." ''তুমি আমাকে দেখাও তো, মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কি এনেছেন? তরবারীর মাধ্যমে তার ধর্ম প্রচার করার নির্দেশের মত অমানবিক ও অশুভ বিষয় ছাড়া আর কিছুই তুমি পাবে না।''

মানবতার জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্যিই কী নতুন শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ''কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)'' নামে একটি গ্রন্থ রচনার একান্ত ইচ্ছা রয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি। এখানে ''জিহাদ'' পরিভাষার অপব্যবহার বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা জিহাদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করতে চাই,

যেন আমরা অন্তত জিহাদ বিষয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কী নিয়ে এসেছিলেন তা আমরা জানতে পারি।

এখানে উলেখ্য যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলের ‘‘ভার্সনগুলির’’ মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য ও অমিল রয়েছে। ইহূদী বাইবেলের সাথে খৃস্টান বাইবেলের অমিল রয়েছে। তেমনি ক্যাথলিক খৃস্টানগণের বাইবেলের সাথে প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের বাইবেলের অমিল রয়েছে। সর্বাবস্থায় আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আল্লাহর কিতাব নয়। এর মধ্যে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী গ্রন্থের কিছু অংশ থাকলেও তা পুরোহিতদের সংযোজন, বিয়োজন ও বিকৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। যে সকল অমানবিক ও অশুভ বিষয় রয়েছে তা সবই এরূপ বিকৃত তথ্য।তবে ইহূদী ও খৃস্টানগণ প্রচলিত এ বাইবেলকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন। ইহদীগণ শুধু ‘পুরাতন নিয়ম’কেই ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। আর খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও কথাই আল্লাহর বাণী।উপরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি বাণী ও বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্যই যীশুখৃস্ট আগমন করেছিলেন। তিনি বলেন: Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword ‘‘মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।’’

উপরন্তু যীশুখৃস্ট তার রাজত্বের বিরোধীদেরকে তাঁর সামনে জবাই করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me", ‘‘পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে
রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।’’বাইবেলে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নেককার সাধু-সন্তদের মূল কাজ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বদা দু-ধারি তরবারী সাথে নিয়ে কাফির-বিধর্মীদের কতল করা ও শাস্তি দেওয়া। আর এভাবে কাফির-বিধর্মীদের হত্যা, বন্দী ও বিচার করাই সাধুদের মূল কর্ম ও মর্যাদা:
"Let the saints be joyful in glory... Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand; To execute vengeance upon

the heathen, and punishments upon the people; To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. ‘‘সাধুগণ গৌরবে উদ্ভাসিত হউক। ... তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বি-ধার খড়্গ থাকুক; যেন তারা বিধর্মী-কাফিরদের প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; যেন তাহাদের রাজাগণকে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে; যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই সমস্ত সাধুর মর্যাদা।’’

"For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven". ‘‘আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যনত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যনত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।’’ এছাড়া আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বাইবেলের নতুন নিয়মেও যীশু তাঁর রাজত্বের প্রতি অনীহা পোষণকারীদের তার সামনে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তরবারী বা যুদ্ধের জন্যই তাঁর আগমন।

বাইবেলে অন্য ধর্ম বা বর্ণের মানুষদেরকে শূকর, কুকুর ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হয়েছে। অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর ও শূকর আখ্যায়িত করে তাদেরকে খৃস্টান ধর্মের দীক্ষা দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যীশু বলেন: "Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine...", ‘‘পবিত্র বস্ত্ত কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সম্মুখে ফেলিও না’’

অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর আখ্যায়িত করে তাদের জন্য দুআ করতে বা তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক দিতেও আপত্তি করেন যীশু খৃস্ট। মথি তাঁর সুসমাচারে লিখেছেন: "And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his

disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs."

“আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সনতান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সনতানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।”

প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো পাঠকের কাছে কথাগুলি খুবই আপত্তিকর মনে হবে। জন্ম, বংশ বা ধর্মের কারণে মানুষকে কুকুর বলে অভিহিত করা! শুধুমাত্র বংশ বা ধর্মের কারণে তাকে মানবিক সাহায্য করতে অস্বীকার করা!! একজন খৃস্টধর্ম বিরোধী পাঠক দাবি করতে পারেন যে, এ বক্তব্য দ্বারা জাতিগত বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ চিরস্থায়ী করা হয়েছে। তিনি দাবি করতে পারেন যে, বাইবেলের উপর্যুক্ত সকল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল দর্শন যীশুর এ কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কেউ এ দাবীও করতে পারেন যে, বর্তমান যুগে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে গণহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে পোপ কোনো প্রতিবাদ না করে ইসলামের নবীর সমালোচনা করছেন এর কারণও এ ‘কুকুর’ দর্শন। যে দর্শনের মূল হলো, ইহূদীখৃস্টানগণ ঈশ্বরের সন্তান। অন্য সকল মানুষ কুকুরের মতই মানবেতর প্রাণী। কুকুরকে যেমন পচা বা ছেড়া রুটির টুকরো ছুড়ে দেওয়া যায়, তেমনি এদেরকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি করে তাদের কোনো উপকার করা যাবে না। যদি ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি হয় তবে লক্ষকোটি সারমেয় সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া ঈশ্বরের সন্তানগণ যদি কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য দুচার হাজার বা দুচার লক্ষ সারমেয় সন্তানকে হত্যা করে ফেলেন তাতেও অসুবিধা কী?

বাইবেলে অন্যধর্মের অনুসারীদের ঠান্ডামাথায় হত্যার নির্দেশনা, এমনকি প্রতারণামূলকভাবে

ডেকে এনে হত্যা করার নির্দেশনা রয়েছে। একটি ঘটনা দেখুন। ইহূদীদের প্রাচীন রাষ্ট্র ‘‘ইসরায়েলের’’ কিছু নাগরিক ‘‘বাল’’ দেবতার উপাসনা করত। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ইস্রায়েলের সম্রাট যেহূ (Jehu, the son of Jehoshaphat) ঈশ্বরের সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ‘‘বাল’’ দেবতার উপাসকদের ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, সম্রাট যেহূ বাল দেবতার সেবা করবেন। এ জন্য তিনি বাল দেবতার উপাসকদের এক মহা- সমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে ভেট ও উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গোপনে উৎসবকেন্দ্র ও মন্দিরের চারিপাশে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে উৎসবরত সকল ‘‘বিধর্মী’’-কে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি তাঁর সৈন্যদের বলেন, যদি একজন বিধর্মীও জীবন নিয়ে পালায় তবে তার বিনিময়ে একজন সৈন্য হত্যা করা হবে। এভাবে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেন।

অন্য ঘটনায় বাইবেলীয় নবী এলিজাহ (Prophet Elijah) বাল দেবতার ৪৫০ জন উপাসককে ধরে ঠান্ডা মাথায় জবাই করেন। [2] এ সকল ঘটনা থেকে খৃস্টান পোপ, পাদরী ও বিশপগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খৃস্টান দেশে বসবাস রত সকল অখৃস্টান নাগরিক এবং ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদেরকে হত্যা ও নির্মূল করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও অধিকার। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি আইজাক বাদারকান ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তার লেখা ‘‘পুস্তিকা ত্রয়োদশ’’ গ্রন্থে লিখেছেন: রোম থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত বাইবেল ইনডেক্সের ‘‘হা’’ অক্ষরের মধ্যে ‘‘হারতাকা’’ (heresy) বিষয়ে লেখা হয়েছে: ‘‘ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা বিদআতী ফিরকার (heretics) বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা; কারণ সম্রাট যেহূ প্রতারণার মাধ্যমে বাল দেবতার অনুসারীদের জমায়েত করে হত্যা করেছেনা এবং নবী এলিজাহ বাল দেবতার অনুসারীদের জবাই করেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধর্মীদের এভাবে হত্যা ও নির্মূল করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

১৪৯৩ খৃস্টাব্দে স্পেনের সম্রাট ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা এক আদেশ জারি করেন যে, যারা ‘সঠিক ধর্ম বিশ্বাস’ (খৃস্টধর্ম) গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (এ আজ্ঞার ভিত্তিতে) ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও অন্যান্যরা আমেরিকায় যেয়ে সেখানকার মিলিয়ন মিলিয়ন বাসিন্দাকে (রেড ইন্ডিয়ান) হত্যা করেন। খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে তারা

তাদেরকে হত্যা করেননি। বরং স্প্যানিশ ভাষা না জানায় তারা খৃস্টধর্মের বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না। এ অপরাধে তারা তাদেরকে হত্যা করেন।''

শুধু মুসলিম, ইহূদী বা অখৃস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খৃস্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছেন। আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade), এ্যালবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade), সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of Saint Bartholomew's Day), ইনকুইজিশন (Inquisition), ধর্মের যুদ্ধ (The Wars of Religion), ইহূদী বিরোধিতা (Anti-Semitism) ইত্যাদি আর্টিকেল পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যদিও আধুনিক গ্রন্থগুলিতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়, নিহতদের সংখ্যা কম করা হয় এবং ''ধর্ম'' ও ''চার্চ''-কে বাঁচিয়ে অন্যদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। তারপরও যেটুক সত্য দেখবেন তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠবে! একেক যুদ্ধ বা হত্যাকান্ডে ১০/২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কখনো যুদ্ধ করে এবং কখনো যুদ্ধ ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালিয়ে।

এ হলো ইহূদী-খৃস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের বা ধর্মীয় হত্যাকান্ডের অবস্থা। এ সকল বর্বরতা কখনো খৃস্টান সম্রাটশাসকগণের নেতৃত্বে ঘটেছে এবং পোপগণ তা সমর্থন করেছেন। কখনো স্বয়ং পোপের নেতৃত্বে এরূপ বর্বর নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ (!) ও উদার (!) খৃস্টান বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতাদের কথবার্তার মধ্যেও আমরা উপরের মানসিকতার ছায়া দেখতে পাই। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করা হলেও এখন পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশের আদালতেও তা প্রমাণ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ''আল-কায়েদার'' অপরাধের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে নেতাদের হত্যা ও মুসলমানদের জোরপূর্বক খৃস্টান বানানোর দাবিদাওয়া জানাচ্ছেন তাদের অনেকেই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী কলামিস্ট অ্যান কাল্টার (Ann Coulter) -এর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

'দ্যা সেভেইজ ন্যাশনস' নামক রেডিও শোতে (১২ মে ২০০৩) প্রচারিত মাইকেল সেভেইজের মতামত পশ্চিমা দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করা হয়। তিনি তার শোতে বলেন: ''আমার মনে হয় এই লোকগুলোকে (আরব ও মুসলমানদেরকে) জোর করে

খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভবত তাদেরকে মানুষে পরিণত করা যাবে।''এভাবে আরো অনেক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য উদার, পরমতসহিষ্ণু ও ধর্মনিরপেক্ষ (?!) রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক ও গবেষক মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন! আরেক মার্কিন সিনেটর দাবি করলেন যে, আমেরিকায় যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হলে বুঝতে হবে যে, তা মুসলিমগণ করেছে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আর এধরনের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদগণ ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করছেন।

অথচ মুসলিম মানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত
করার বা কাউকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমরা দেখছি যে, সবচেয়ে সহিংস মুসলিম সন্ত্রাসীও অন্যের ধর্মকে অবমাননা করার চেষ্টা করছে না বা অন্য ধর্মের মানুষকে জবরদস্তিকরে মুসলিম বানানোর আহবান করছে না। সুসভ্য, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী 'ধর্মনিরপেক্ষ' খৃস্টানগণ মুসলিমদের পবিত্র কুরআনকে অপবিত্র করেছে। মানবতাবাদী ও ভালবাসার প্রচারক (?!) খৃস্টান পাদরিগণ কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করার দাবি সম্বলিত ফলক চার্চের সামনে টানিয়ে রাখছেন।[6] তারা মুসলিমদের পবিত্র নবীকে (ﷺ) নিয়ে ঘৃণ্য কার্টুন তৈরি করেছে।

সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এ ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মার্কিন বা ডেনিশ পতাকায় অথবা এ সব দেশের রাজনীতিবিদদের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। কিন্তু কখনোই কোনো মুসলিম খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করেননি। বাজার থেকে একটি বাইবেল কিনে তাতে পেশাব করেননি বা তাতে অগ্নি সংযোগ করেননি বা যীশু খৃস্টের অবমাননাকর কার্টুন প্রচার করেননি। পাশ্চাত্যের সুসভ্য ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের দৃষ্টিতে একেবারে অশিক্ষিত, অসভ্য ও উগ্র কোনো মোল্লাও কখনো খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থকে অপবিত্র করতে বা যীশু নামে কার্টুন তৈরি করতে আহবান করেননি। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ও উগ্র মৌলবাদীদের একজনকেও আমরা দেখছি না যে, সে খৃস্টানদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহবান জানাচ্ছে। তারা হয়ত মি. বুশকে হত্যার আহবান করছে। কিন্তু তা তার খৃস্টান হওয়ার কারণে নয়, আমেরিকান হওয়ার কারণে নয় বা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সেবক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাকে আগ্রাসক, জালিম ও হত্যাকারী বলে মনে করার কারণে। একই কারণে তারা হয়ত আমেরিকা বা ইস্রাইলের ধ্বংসের জন্য আহবান করছে।

কিন্তু কখনোই তারা কোনো ইহূদী বা খৃস্টানকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহবান করছে না।

জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহার:

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। আর ইসলামী শরীয়তের পারিভাষায় জিহাদ অর্থ ‘‘কিতাল’’ বা রাষ্ট্র ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুম-আহকাম পালনের সকল প্রচেষ্টাকেই শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা যায়, কিন্তু আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার পারিভাষিক অর্থের বিকৃতির সুযোগ করে দেয়। যেমন ‘সালাত’-এর আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা। যে কোনো প্রার্থনাকেই সালাত বলা যায় এবং কুরাআন-হাদীসে কখনো কখনো তা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় ‘সালাত’ একটি নির্দিষ্ট ইবাদাতের নাম। সকল প্রার্থনাকেই সালাত বলে নামকরণ করলে তা দ্বিমুখি বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। প্রথমত কেউ হয়ত যে কোনোভাবে প্রার্থনা করেই ‘সালাত’ কায়েম হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করবেন। দ্বিতীয়ত, কেউ সালাতের ফযীলত বা আহকামের আয়াত ও হাদীসগুলি সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবেন।

কেউ যদি নিজের জীবনে দীন পালন, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, ইলম শিক্ষা, হালাল উপার্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, অত্যাচারীর সামনে সত্য-ভাষণ, হজ্জ পালন বা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলেন তবে তা দূষণীয় নয়, বরং তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এগুলিকে পারিভাষিক ‘‘জিহাদ’’ মনে করা হলে তা বহুমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে জিহাদের ফযীলত ও আহকামসমূহ এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দেবে। কোনো কোনো আধুনিক গবেষক ও চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব বুঝাতে ‘‘জিহাদ’’ বলে অভিহিত করেছেন। ‘‘জামাআতুল মুসলিমীন’’ এরূপ ব্যবহারকে তাদের বিভ্রান্তির সমর্থনে ব্যবহার করেছে।

‘‘ইসলামী রাজনীতি’’ বা ‘‘ইসলামী আন্দোলন’’-এর মাধ্যমে ‘‘দীন প্রতিষ্ঠা’’ নামে মুমিন যে ইবাদতটি পালন করেন সে ইবাদতটির পারিভাষিক নাম হলো ‘‘আল্লাহর পথে দাওয়াত’’ বা ‘‘ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ’’। এ কর্মকে ‘‘জিহাদ’’ বলায় অসুবিধা নেই। তবে এ কর্মই কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পারিভাষিক জিহাদ বা বলে মনে করার মধ্যে রয়েছে সমূহ

বিপদ। আমরা বলেছি যে, ইসলামের পরিভাষায় "জিহাদ" অর্থই "কিতাল" বা যুদ্ধ। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের ব্যবহারে এবং ফিকহ, তাফসীর বা ইসলামী জ্ঞানের যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ তালাশ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। বর্তমানে অনেক আধুনিক গবেষক "ইসলামী রাজনীতি" বা "ইসলামী আন্দোলন"-কে "জিহাদ" নামে আখ্যায়িত করেন এবং একেই ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে গণ্য করেন। অনেকে পারিভাষিকভাবে "জিহাদ" ও "কিতাল"-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। কিতালকে যুদ্ধ এবং জিহাদকে আন্দোলন বলে মনে করেন। এরূপ মতামত গবেষণা বা ব্যাখ্যা হিসেবে কেউ পেশ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের পারিভাষা বলে গণ্য করার কারণে এবং রাজনীতি, দাওয়াত, আন্দোলন ইত্যাদিকে সদা-সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার কারণে ত্রিমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে:

প্রথমত, দাওয়াত, রাজনীতি, আন্দোলন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত মানুষ শরীয়ত নির্দেশিত "জিহাদ" ইবাদতটি পালন করছেন বলে ধারণা করছেন এবং হাদীসে ও ফিকহে জিহাদের যে সকল বিধান, সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও পালনীয় বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দলবদ্ধ দাওয়াতের সাথে সংশিষ্ট না হয়ে যারা ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ওয়ায, লিখনী, শিক্ষাদান ইত্যাদি পদ্ধতিতে "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের" ইবাদতটি পালন করছেন তারা শরীয়তের পারিভাষিক "জিহাদ" নামক ইবাদতটি পালন করছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে বিশ্বাস করে এ জন্য বলপ্রয়োগ, অস্ত্রধারণ ও অনুরূপ বিধানকে বৈধ বলে মনে করা হচ্ছে। আমি "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[1]

বিশেষত তৃতীয় বিভ্রান্তিটি উগ্রতার জন্ম দিচ্ছে। যে সকল আলিম বা গবেষক এ সকল কর্মকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করছেন তাঁরা মূলত এগুলির গুরুত্ব বুঝাতে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আভিধানিক অর্থে তা করছেন। কোনো আলিম যখন দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, আন্দোলন, রাজনীতি, মিছিল ইত্যাদিকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন, তখন তিনি বুঝান না যে, এ কর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করা যাবে, অথবা এর বিরোধীদেরকে আঘাত করা যাবে। কিন্তু তিনি না বুঝালেও শ্রোতা, পাঠক বা সংশিষ্ট অনেকেই তা বুঝছেন। জামাআতুল মুসলিমীন ও

উগ্রতায় লিপ্ত অন্যান্য মানুষের লিখনি ও বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সমকালীন আলিম ও গবেষকদের এ সকল বক্তব্য থেকে তারা এরূপই বুঝেছেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা বুঝেছেন যে, মানুষদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো জিহাদ। আর জিহাদ হলে তো মারামারি, অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ ও হত্যা হবেই। বস্তুত, উগ্রতার ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর:
প্রথমত, জিহাদই ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পথ বলে দাবি করা।
দ্বিতীয়ত, জিহাদের জন্য অস্ত্রধারণ, হত্যা, মৃত্যুবরণ ইত্যাদিকে বৈধ বা আবশ্যকীয় বলে দাবি করা।
কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা তাঁদের জন্য খুবই সহজ বিষয়। এজন্য তাঁদের বিভ্রান্তির মূল উৎস প্রথম বিষয়ের মধ্যে নিহিত। আমরা দেখেছি যে, পারিভাষিক 'জিহাদ' কখনোই ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যম। কিন্তু জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহারে ফলে অনেকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জিহাদই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ বা একমাত্র পথ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা সকলের জন্য ফরয।

জঙ্গিদের প্রচারকর্ম এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তারা কিছু সরলপ্রাণ আবেগী যুবককে সহজেই একথা বুঝাতে পারছে যে, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম ফরয, জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না। আর জিহাদ মানেই তো অস্ত্র, যুদ্ধ ও হত্যা, কাজেই এখনই আমাদের সে কাজে নেমে পড়তে হবে। এভাবেই গুরুত্বারোপের জন্য একটি পরিভাষার আভিধানিক অর্থের অতিব্যহার বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করছে।

পক্ষান্তরে দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে ''আল্লাহর পথে দাওয়াত'' নামে আখ্যায়িত করলে একদিকে যেমন সঠিক ইসলামী পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে উপর্যুক্ত ত্রিবিধ অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তির পথ রুদ্ধ হবে, তেমনি অন্যদিকে এ সকল ইবাদত পালনের সঠিক সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানা সহজ হবে। কারণ দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার ফলে আগ্রহী মুমিন এ সকল কর্মের ইসলামী নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও সাহাবীগণের সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানার জন্য হাদীস ও ফিকহের ''জিহাদ'' অধ্যায় অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন, ''আল্লাহর পথে দাওয়াত'' বা ''ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'' অধ্যায় অধ্যয়নের কথা তার মনে আসে না।
আমরা আশা করি যে, দীনী দাওয়াতের এ সকল ময়দানে যারা কর্মরত এবং এ সকল বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারা এ সকল কর্মকান্ডের পারিভাষিক পরিচয় নিশ্চিত করবেন।

এগুলিকে ‘‘ন্যয়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ’’ বা ‘‘আল্লাহর পথে দাওয়াত’’ নামে আখ্যায়িত করলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও জযবাকে বিপথগামী করার বা সহিংসতায় পর্যবসিত করার একটি বড় পথ রুদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। মহান আল্লাহই ভাল জানেন এবং তিনিই তাওফীক দাতা।

জিহাদ ফরয আইন এবং বড় ফরয:

নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার আবেগে প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ ‘‘জিহাদ’’ নামক ইবাদতকে ‘‘ফরয আইন’’ বা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে দাবি করেছেন। উপরন্তু তারা ‘‘জিহাদ’’-কে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরয বলে দাবি করেছে। প্রাচীন খারিজীগণের মতামত বর্ণনায় একজন গবেষক লিখেছেন: "The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"... "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād".
‘‘খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জিহাদ। খারিজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত ‘সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ’ বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে...।’’আবেগী খারিজীগণ সর্বদা জিহাদের অতুলনীয় সাওয়াব ও গুরুত্ব বিষয়ক আয়াতগুলিকে তাদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করত। তাদের উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস জিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই তাকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা যে, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরত্বপূর্ণ। তবে সেগুলির মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের বেশিকম সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং ‘সুন্নাতের’ আলোকে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের মধ্য থেকে বুঝতে হবে। আর কুরআন, হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের আচরিত

প্রায়োগিক সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ সবচেয়ে ফরয নয়, দীনের রুকনও নয় এবং ফরয আইনও নয়। বরং জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

মানুষেরা (অন্যায় অনাচার ও পাপে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন এ-ই আমাকে যুদ্ধে বেরোতে নিষেধ করছে। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।''

না হয়'। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।''

এখানেও খারিজীগণ কুরআনের দু-একটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইবনু উমার (রা)-এর জিহাদ পরিত্যাগ করে হজ্জ উমরা পালনকে আপত্তিকর বলে দাবি করেছে। ইবনু উমার (রা) তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি:

প্রথমত, শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না।

কুরআন কারীম ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে কোন্টি অধিকগুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি কোনটি সামষ্টিক, কোনটি রাষ্ট্রীয়, কোন্টি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোন্টি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। এ সকল কুরআনী নিদেশ যিনি গ্রহন করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও নির্দেশনা থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে, কুরআনে উলিখিত সকল নির্দেশের মধ্যে এ পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপর্ণ এবং এগুলির উপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত,

আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে যে ছাড় বা সুযোগ আছে তা আরকানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেই। তাঁরা বুঝতেন যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয় যে, তা পরিত্যগ করলে গোনাহ হবে। বরং বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র আরকানে ইসলাম পালনকারীকে পূর্ণ মুসলিম ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ পরিত্যাগকারী আরকান পালনকারী মুমিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।। অনেক হাদীসে বিশৃঙ্খলা, ফিতনা বা হানাহানির সময়ে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অন্যত্র পিতামাতার খেদমত বা আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি মুসলিম বাহিনীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে অমুক, অমুককে হত্যা করেছে, আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! কেয়ামতের দিন যখন এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? কেয়ামতের দিন যখন এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? এভাবে তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা ও তাকে হত্যা করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে এদেরকে সাবধান করছেন।

শাহাদাত ও শহীদের মর্যাদা :

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে যিনি শুধুমাত্র আল্লাহকে রাযী-খুশী করার নিয়তে নিজের জীবনকে কুরবানী করেন তিনিই “শহীদ”। তাঁর জীবন উৎসর্গ করার সত্যের বাস্তব সাক্ষ্যকে বলা হয় "শাহাদাত"। শাহাদাত অর্থ হলো: اسْتَشْهَدَ تَعَرَّضَ أَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّه. "আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করা। "
"শহীদ"-এর সংজ্ঞা প্রসংগে চার মাযহাবের ইমামদের মতামত নিম্নরূপঃ

"হানাফী মাযহাবে 'শহীদ' বলতে বুঝায়:

الشَّهِيدُ هُوَ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا ، سَوَاءُ قُتِلَ فِي حَرْبٍ أَوْ قَتَلَهُ بَاغِي أَوْ حَرْبِي أَوْ قَاطِعُ طَرِيقِ أَوْ لِص . "শহীদ” ঐ ব্যক্তি (যে মুসলমান) মাযলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে। চাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে

নিহত হন অথবা কোনো বিদ্রোহী কিংবা কোনো শত্রু তাকে হত্যা করুক অথবা কোনো চোর বা ডাকাত তাকে নিহত করুক।

"*হাম্বলী মাযহাবের শহীদ হলো:*

الشَّهِيدُ هُوَ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ قِتَالِ كُفَّارٍ حِيْنَ قِيَامِ الْقِتَال" ِ

শহীদ" তিনি যিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সময় নিহত হয়েছেন।

মালিকী মাযহাবে শহীদ হলো:

الشَّهِيدُ هُوَ مَنْ قَتَلَهُ كَافِرٌ حَرْبِي أَوْ قُتِلَ فِي مَعْرِكَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّار.ِ

শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো কাফের যোদ্ধা হত্যা করেছে অথবা মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে লড়াইয়ে মারা গেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের শহীদ হলো:

شهيد الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا غُلُولٍ مِنَ الْغَنِيمَة. ِ

শহীদ: দুনিয়া ও আখেরাতের শহীদ: যিনি গনীমতের মাল গোপনে
আত্মসাৎ করার অথবা রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

মু'মিন যখন আল্লাহর বিধানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন তখন তার মৃত্যু যে কোনো অবস্থায় হোক উক্ত মৃত্যুকে শাহাদাতের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ পর্যায়ে ফকিহগণ "শাহাদাত"-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

এক: দুনিয়া ও আখেরাতের শহীদ: ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে দীন বিজয়ের জন্য জিহাদী সংগ্রামে নিহত মুসলিমই পূর্ণ শাহাদাতের অধিকারী। এ শাহাদাতই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ উত্তম সওয়াবের অধিকারী শাহাদাত।

দুই: দুনিয়ার শহীদ: যিনি প্রকাশ্যভাবে দীনের জিহাদে শরীক হন, কিন্তু তার এই জিহাদের মাধ্যমে গোপন উদ্দেশ্য থাকে গনীমত হাসিল করা অথবা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করা, যার মধ্যে 'রিয়া' ও 'নিফাক' বর্তমান থাকে। এমনি জিহাদে তার মৃত্যু হলে তিনি হন দুনিয়ার শহীদ, এ ধরনের শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট কোনো সওয়াব নেই।

তিন: আখেরাতের শহীদ: যিনি মানুষের অজ্ঞাতে কোনো পাথর চাপা পড়ে অথবা পানিতে ডুবে অথবা অন্যান্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শুধু আখেরাতের শহীদ। হাদীসের ভাষ্যমতে আখেরাতের শহীদও আল্লাহর নিকট সওয়াব পাবেন।

ইসলামী শরীয়াতের বিধান মোতাবেক শহীদদের মৃতদেহ দাফন কাফনের জন্য বিভিন্ন মাযহাবের মতামত বিভিন্ন রকম। তাহলো নিম্নরূপঃ

* দুনিয়া ও আখেরাতের শহীদ এবং দুনিয়ার শহীদ এই দুই বিভাগের শহীদদের দাফন-কাফনের ব্যাপারে:

১. হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে, উক্ত শহীদের লাশের গোসল দেয়া যাবে না, ও কাফন পরানো যাবে না, কিন্তু জানাযার নামায পড়তে হবে। যে অবস্থায় ও যে কাপড়ে শহীদ হবে সে অবস্থায়ই দাফন করতে হবে।

২. হাম্বলী, মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাবে বলা হয়েছে, উক্ত শহীদি লাশের গোসল, কাফন ও জানাযা নামায কিছুই হবে না, নিহত অবস্থায়ই দাফন করে দিতে হবে।

৩. আখেরাতের শহীদ যাদের নিয়ত সম্পর্কে কোনো নিদর্শনের সংবাদ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তাই তাদের লাশের গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে ও জানাযার নামায পড়তে হবে এবং দাফন করতে হবে। আল্লাহর নিকট সওয়াব ও বিনিময়ের ব্যাপারে পরকালে তাঁরা শহীদের মর্যাদা পাবেন। ১

অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রমের মতই কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদে শহীদ হয়েছে, আর কে লোক দেখানোর জন্য অথবা বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য, আর কে নাম ঐশ্বর্য প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থ ও গনিমতের

মালপত্র হাসিল করার জন্য শহীদ হয়েছে, তার শাহাদাত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু দুনিয়াবী দৃষ্টিতে যে যেই বিভাগে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে তার সাথে মাযহাব অনুযায়ী জানাযা, গোসল ও দাফন-কাফন দেয়া হবে। আল্লাহ মুজাহিদদের নিয়ত খালেছ করার তৌফিক দিন।

শহীদের মর্যাদা:

১. শহীদগণ মৃত নন, জীবিত। তাঁরা আল্লাহর নিকট থেকে রিযিক প্রাপ্ত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তোমরা তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।"-সূরা আলে ইমরান: ১৬৯

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُون
"আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।"

-সূরা আল বাকারা: ১৫৪

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবিত মানুষের চর্মচক্ষে শহীদদেরকে প্রাণহীন মৃত লাশ দেখলেও আসলে আল্লাহর নিকট তারা মৃত নন, তাদেরকে মৃত মনে করতে ও মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। শহীদদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা শহীদদেরকে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাহলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাদের বেশী অনুভূতি দেয়া হয়। অনেক সময় তাদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না। জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ নিজ নিজ ওয়ারিসগণের

মধ্যে বণ্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ ইদ্দত পালনের পরে অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। ১ আল্লাহর পথে শাহাদাত প্রাপ্তির কারণে তারা আল্লাহর নিকট জীবিত লোকদের মত জান্নাতী নেয়ামত ও শান্তি ভোগ করে থাকে, কিন্তু জীবিত মানুষ তা বুঝতে পারে না।

২. শহীদগণ আল্লাহর পুরস্কার পেয়ে হয় আনন্দিত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَرِحِينَ بِمَاءَ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لا أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِين. ۘ

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা (শহীদগণ) আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না, আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ কারণে যে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।"-সূরা আলে ইমরান: ১৭০-১৭১

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মু'মিনগণ নিজ নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট থেকে এমন মহান পুরস্কার ও নিয়ামত পাবেন যে, সীমাহীন আনন্দে তারা আত্মহারা হয়ে যাবেন, দুনিয়ায় যারা জিহাদে ব্যস্ত রয়েছে তারাও শীঘ্রই শহীদ হয়ে তাদের সাথে মিলিত হলে তারাও অনুরূপ পুরস্কার ও নিয়ামতের অধিকারী হওয়ার সুসংবাদেও শহীদগণ আনন্দিত, যার কারণে দুনিয়ার জীবনে সকল দুঃখ-কষ্ট শহীদগণ ভুলে যাবেন।

৩. শহীদগণ শাহাদাতের অকল্পনীয় পুরস্কার দেখে পুনরায় জিহাদ করে শহীদ হওয়ার জন্য দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে:

হাদীসে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أخرى

"হযরত আনাস ইবন মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: একমাত্র শহীদ ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পরে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আনন্দ পাবে না, সে আল্লাহর নিকট এমন কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে যা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদের সমকক্ষ। কেননা সে বাস্তবে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে, সুতরাং সে দুনিয়ায় ফিরে এসে আর একবার আল্লাহর পথে প্রাণ দিতে আনন্দ অনুভব করবে।"-সহীহ আল বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوَدِدْتُ إِنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أَحْيِ ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيِ ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أحْيِ ثُمَّ أُقْتَلُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি: সেই সত্তার শপথ যাঁর মুঠির মধ্যে আমার প্রাণ! আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, অতপর জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই, তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই।"

মানুষ সাধারণত মৃত্যুকেই অধিক ভয় করে থাকে, কিন্তু শাহাদাতের পুরস্কার এত বেশী যে, শহীদ ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা দেখে বারবার জীবিত হয়ে বারবার শহীদ হয়ে উক্ত মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে।

৪. শহীদদের উপর ফেরেশতারা ছায়া দান করেন:

হাদীসে এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) يَقُولُ جِئَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَسُمِعَ صَوْتُ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ فَلَا تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا.
"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আব্বার লাশ রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে এনে রাখা হলো। তাঁর লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চক্ষু উপড়ান)

করা হয়েছিলো। আমি তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে গেলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। ইতিমধ্যে কোনো ক্রন্দনকারিনীর ক্রন্দন-ধ্বনী ভেসে আসলো। বলা হলো আমরের কন্যা বা ভাগ্নি ক্রন্দন করছে। রাসূলুল্লাহ স. বললেন: ক্রন্দন করছ কেন অথবা ক্রন্দন কর না, এখনও ফেরেশতারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছে।"-সহীহ আল বুখারী কিতাবুল জিহাদ

অর্থাৎ শহীদকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁর মহান রহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন।

৫. মর্যাদার দিক দিয়ে শহীদগণ চার ভাগে বিভক্ত:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ فَلَا أَدْرِي فَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ فَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضَرَبٌ جِلْدَهُ بِشَوْكَ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمُ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি: শহীদগণ চার ভাগে বিভক্তঃ ***প্রথমতঃ*** উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে শত্রুর মুকাবিলায় ঈমানের দাবী পূরণে আল্লাহর নির্দেশ পালনের হক যথাযথভাবে আদায় করে শহীদ হয়ে গেলো। সে ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদার কারণে কিয়ামতের দিন মানুষ তাঁর দিকে এভাবে চোখ তুলে তাকাবে যে, তাঁর মাথা এমনভাবে জাগালেন যে, মাথার টুপি পড়ে গেল। বর্ণনাকারী কি হযরত উমরের টুপি পড়ে যাওয়ার কথা বললেন না রসূলুল্লাহ স.-এর টুপি পড়ে যাওয়ার কথা বললেন তা ঠিক বুঝা গেল না সে, প্রথম শ্রেণীর শহীদ।"

দ্বিতীয়ত: উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর পথের জিহাদে শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো, শত্রু তাকে মরণাস্ত্র দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করলো তাতে সে শহীদ হয়ে গেলো। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর

তৃতীয়: যে ঈমানদার ব্যক্তি সৎকাজের সাথে কিছু অসৎকাজও করেছে। আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে নিহত হলে সে তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ।

চতুর্থ: যে দুর্বল ঈমানদার নাফরমানীর গুনাহে জর্জরিত, দীন বিজয়ের জিহাদে লিপ্ত হয়ে নিহত হলে সে চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ। ১

৬. শাহাদাতের কারণে শহীদের ঋণ ছাড়া সকল গুনাহ মাফ হয়:

হাদীসের ভাষ্য:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

"হযরত 'আমর ইবনুল 'আস রা, থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: 'শহীদের ঋণ ছাড়া তার সকল গুনাহ শাহাদাত প্রাপ্তির কারণে ক্ষমা হয়ে যায়।"-সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদে নিজের জীবন উৎসর্গ করার কারণে আল্লাহর হকের সাথে জড়িত সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু ঋণ যেহেতু মানুষের হক তা পাওনাদার ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

৭. শহীদদের রূহসমূহ আরশের সাথে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মত আলোকিত ও জান্নাতে বিচরণকারী সবুজ পাখীর পেটে অবস্থান করবে:

হাদীসে বর্ণিত আছে:

عَنْ مَسْرُوق (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ

هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا أَيُّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَتْرُكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا يَارَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَامِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً تُرِكُوا.

"হযরত মাসরুক রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: শহীদদের রূহসমূহ আরশের সাথে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মত সবুজ পাখীদের পেটে স্থাপন করা হবে। পাখীগুলো জান্নাতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে। অতপর তাদেরকে জান্নাতের সকল নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করা হবে। পরে তাদের আরো চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা অবাক হয়ে বলবে: আমরা জান্নাতের সকল কিছু স্বাধীনভাবে ভোগ করছি, আমাদের আবার চাহিদা কিসের? এমনিভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হবে, পরে যখন তারা দেখবে যে, প্রশ্ন অব্যাহত রয়েছে তখন তারা আরয করবে: হে আমাদের রব! আমাদের রূহগুলোকে আমাদের শরীরে স্থাপন করো, আমরা দুনিয়ায় গিয়ে পুনরায় তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হই। অতপর তাদের এই চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তাদেরকে প্রশ্ন করা বাদ দেয়া হবে।"১

আল্লাহর পথে জিহাদকারী শহীদগণ এত সম্মানিত হবেন যে, সকল ধরনের নিয়ামত ভোগ করার জন্য জান্নাতের সর্বত্র তারা সবুজ পাখীর বেশে উড়ে বেড়াবে। শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দেখে অবাক হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় এসে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা প্রাপ্তির আশা ছাড়া আর কোনো আশা তাদের থাকবে না।

৮. আল্লাহর পথে ধৈর্যের সাথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাওয়াই সকল অপরাধ ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ:

হাদীসে বলা হয়েছে

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيْمَانُ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلُ غَيْرَ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنُ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِك.

"হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. সাহাবীদের রা. মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ ও আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ সর্বোত্তম কাজ বলে উল্লেখ করলেন। তখন জনৈক

ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদে শহীদ হয়ে যাই তাহলে কি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বললেনঃ হ্যাঁ যদি তুমি আল্লাহর পথে জিহাদে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হও ও আত্মসমালোচনার সাথে, পিছু না হটে অগ্রসরমান অবস্থায় শাহাদাত বরণ করো, তাহলে তোমার সকাল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। অতপর রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রশ্ন কি ছিল? লোকটি বললো, আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে কি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বললেন: হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে জিহাদে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হও আত্মসমালোচনার সাথে, পিছু না হটেই অগ্রসরমান অবস্থায় শহীদ হও তাহলে তোমার ঋণ ছাড়া সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। হযরত জিবরীল আ. আমাকে একথা বলেছেন।"-সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৯. শহীদদের মৃত্যুকষ্ট সামান্য চিমটি কাটার চেয়ে বেশী নয়:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشهيدُ مِنْ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِ الْقَرْصَة. ِ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেন: শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট হলো তোমাদের মধ্য কেউ সামান্য একটু চিমটি কাটার মত স্পর্শ অনুভব করে মাত্র।"-জামে' আত তিরমিযী, আবওয়াবুল ফাদায়িলিল জিহাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

অর্থাৎ মানুষ নিহত হওয়ার সময় মারণাস্ত্রের আঘাতে যে ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে তা বর্ণনাতীত, কিন্তু শহীদ ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জিহাদরত অবস্থায় বোমার আঘাতে, গুলি লেগে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে অথবা অন্য কোনোভাবে শাহাদাত প্রাপ্তির সময় সামান্য চিমটি কাটার চেয়ে বেশী কষ্ট অনুভব করে না। এটা শহীদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ রহমত ও নিয়ামত।

১০. শহীদের জন্য রয়েছে আরো ছয়টি বিশেষ পুরস্কার:

হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلَ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْيَاقُوتُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ.

"হযরত মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ক. তার শরীর থেকে প্রবাহিত রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়। খ. জান্নাতে তার আবাসস্থান দেখানো হয়। গ. তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হয়। ঘ. ভয়ানক ও আতঙ্কজনক কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে মুক্ত থাকে। ঙ. শহীদের মাথায় মহা সম্মানিত টুপি পরানো হয়, যার একটু ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদের চেয়ে উত্তম, তার সাথে বাহাত্তরজন মহাপবিত্রতমা জান্নাতী হুরের বিয়ে দেয়া হয়। চ. শহীদকে তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। "১

১১. শহীদগণ শাহাদাতের মাধ্যমে ঈমানের দাবী পূরণ করে আল্লাহর প্রশংসা লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا8

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অংগীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-সূরা আল আহযাব: ২৩-২৪

অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিজের জীবনকে কুরবানী করতে পিছপা হবে না বলে মুজাহিদগণ যে অংগীকার করেছিল, শাহদাতের মাধ্যমে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে আর অন্যরা এ জিহাদে লিপ্ত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভের অপেক্ষায় আছে।

১২. আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত কামনাকারীকে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়া হয়:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (رض) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

"হযরত সাহল বিন আবু উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে ও তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেনঃ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত কামনা করে, সে যদি নিজ বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে তবুও আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান করবেন।"

-সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।

১৩. শহীদ ব্যক্তি নিজ আত্মীয়দের থেকে সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে:

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"হযরত আবুদ্দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: শহীদ ব্যক্তি নিজ আহাল পরিজন থেকে সত্তরজনের জন্য আল্লাহর নিকট (জান্নাতের) সুপারিশ করতে পারবে।"-সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৩৪১।

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্থায়ী রেযামন্দী ও খুশী পাওয়ার অধিকারী হয় আল্লাহর পথে জীবন ও মাল-সম্পদ উৎসর্গকারী শহীদ ব্যক্তি। ফলে তিনি তার নিকটাত্মীয় যারা আল্লাহর বিচারে বন্দী হয়ে যাবে ও শাস্তির উপযুক্ত হিসেবে নির্ধারিত হবে তাদের মুক্তির জন্য শহীদ ব্যক্তিকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

১৪. দুনিয়ার শহীদদেরও পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে:

ইসলামী শরী'য়াতের অনুসরণকারী মু'মিনদের মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রেই শাহাদাতের মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءُ فِيكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلُ ؟ قَالُوا فَمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مُقْسِمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ يَعْنِي أَبَا صَالِحٍ، أَنَّهُ قَالَ الْغَرِيقُ شَهِيد.ٌ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেনঃ তোমরা তোমাদের মধ্যে কোন্ ধরনের মৃত্যুকে শহীদ বলে গণ্য করো? সাহাবায়ে কিরাম জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন তিনিই শহীদ। তিনি বলেন, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অবশ্যই নগণ্য হবে। সাহাবা রা. জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে আর কে শহীদ বলে গণ্য হবে! রাসূলুল্লাহ স.

বললেন: যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে মারা গেলো সেও শহীদ। যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা গেলো সেও শহীদ। যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেল সেও শহীদ।

ইবনে মিকসাম বলেন: আপনার পিতা আবু ছালেহ-এর সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, তিনি বলেছেনঃ যে পানিতে ডুবে মারা গেলো সেও শহীদ।"

-সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৩।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয়। মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করলো সে ব্যক্তি।"

১৫. নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করা হয়েছে:

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك (رض) عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ ؟ قَالَ أُنَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى يَرْكَبُوْنَ هُذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عِبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلُ مَارَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا
انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةً

لتَرْكَبَهَا فَصَرَ عَنْهَا فَمَاتَت. ْ

"হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. তার খালা উম্ম হারাম বিনতে মিলহান রা.১ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উম্ম হারাম বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ স. আমার কাছে একটি জায়গায় ঘুমোচ্ছিলেন। পরে তিনি হাসিমুখে জেগে উঠলে আমি তাঁকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন: বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এই নীল সমুদ্রে (ভাসমান জাহাজের) আরোহী হিসেবে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে এইমাত্র স্বপ্নে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিলো। উম্ম হারাম বললেন: আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং পুনরায় পূর্বের মত করলেন। উম্ম হারাম বললেন: আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ স. বললেনঃ তুমি তাদের প্রথম দলে থাকবে।

হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে মুসলিমগণ যখন প্রথমবারের মত সমুদ্রপথে যুদ্ধ করলো, তখন তিনিও (উম্ম হারাম) তাঁর স্বামী উবাদাহ ইবন সামেতের সাথে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধযাত্রা

করলেন। এই যুদ্ধ থেকে তারা (মুসলিমগণ) প্রত্যাবর্তন করে সিরিয়ার (সমুদ্রতীরে) অবতরণ করলে উম্ম হারামের আরোহণের জন্যএকটি সওয়ারী জন্তু আনা হলো। সওয়ারী জন্তুটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তিনি শহীদ হন।"

-সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

সুতরাং আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনে তথা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য শহীদ ব্যক্তির মর্যাদা অসীম বলে উল্লেখিত হয়েছে বিধায় একাজে মু'মিনদের প্রতিযোগিতা করা প্রয়োজন। কেননা, শহীদগণ মৃত্যুবরণ করেও আল্লাহর নিকট জীবিত, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেও পুনরায় দুনিয়ায় এসে পুনরায় শহীদ হতে চায়, তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা প্রাপ্তহয়, তাদের রূহ জান্নাতে উড়ে বেড়ায়, তাঁদের মৃত্যুকালে একটু চিমটিকাটার মত কষ্ট অনুভব হয়, দুনিয়ায় ৭০ জন গুনাহগার আত্মীয়ের জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করা হয়।

উপসংহার:

সমগ্র সৃষ্টিজগতে যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত হয় অনাবিল শান্তি ও মুক্তি তার নাম হল ইসলাম। আর এই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম জাতির উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জিহাদ থেকে বিরত থাকার কারণেই দুস্থ, অনাথ, দুর্বল মানবজাতি আজ নির্যাতিত, বঞ্চিত ও পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদেরকে আল্লাহর দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তিপূর্ণ দীন শিক্ষা দেয়া ও কার্যকরী করার জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে দাওয়াত ও আন্দোলনের মাধ্যমে ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আখেরী যামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ স. মক্কী জীবনে দীর্ঘ ১২/১৩ বছর চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত দাওয়াতী জিহাদের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু লোক তৈরী করেছেন, যারা ইসলামী বিপ্লবের কঠিন জিহাদে নিজেদের জান ও মাল কুরবানী করার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তখন কোনোভাবেই সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি। অথচ মদীনায় হিজরতের পর সেখানে ইসলামী রাষ্টীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ স.-এর ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর সর্বদাই ইকামতে দীনের পথে সশস্ত্র জিহাদ পরিচালিত হয়েছে।

আল্লাহর পথে এ জিহাদ পরিচালনাকারীদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও পুরস্কার প্রাপ্তির সৌভাগ্যের সুসংবাদ আর এ পথে বিরত থাকার পরিণামে দুনিয়ায় চরম লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপিড়ন ও ধ্বংসের সতর্কবাণী সে সাথে পরকালের চরম আযাব ও শাস্তির হুঁশিয়ারি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর বিধান পরিহার করে যত কিছুই ইবাদাত বন্দেগী করা হোক সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যাবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. ْ

"তা এ জন্য যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"-সূরা মুহাম্মদ: ৯

মুমিন জীবনের পরম চাওয়া ও পাওয়ার বিষয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে জান্নাত প্রাপ্তি, তা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হয় আল্লাহর পথের জিহাদে শাহাদাত বরণ করার মাধ্যমে। শহীদগণ শাহাদাতের মাধ্যমে মৃত্যুহীন চিরন্তন জীবন লাভ করেন, অকল্পনীয় পুরস্কার দেখে পুনরায় দুনিয়ায় এসে জিহাদ করে পুনরায় শাহাদাত লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শহীদদের উপর থাকে রহমতের ফেরেশতাদের ছায়া, তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়। কমপক্ষে সত্তরজন আত্মীয়-স্বজনের জন্য শহীদ ব্যক্তির সুপারিশ কবুল করে তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে। কাজেই মুক্তিকামী সকলের জন্য এই মহান শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক জিহাদে শরীক হওয়া।

ইকামতে দীনের এ জিহাদ নফস-প্রবৃত্তিকে দমন করে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ময়দানে কলমের মাধ্যমে চলবে। নেতৃত্বে পরিবর্তনের জন্য সমসাময়িক নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সততা ও ইনসাফপূর্ণ পথে পরিচালিত হবে, রাজনীতি, নির্বাচন ও ভোটাভুটির ময়দানে সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে চলবে সর্বত্র এ জিহাদ। দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাত আলান্নাস, কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ, ইকামাতে দীন ও আমর বিল মারুফ ওয়াননাহী 'আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা ও রাখার জন্য চলবে আল্লাহর পথে জিহাদ।

মানবতার সত্যিকারের মুক্তির জন্য দুনিয়াব্যাপী জিহাদ পরিচালনা করা মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত। এ জন্য অবশ্যই বাতিল শক্তির মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সামরিক শক্তির অধিকারী

হতে হবে, মুজাহিদকে হাসিল করতে হবে রূহানী শক্তি ও বৈষয়িক শক্তি, রপ্ত করতে হবে ময়দানী বিধান, কার্যকরী করতে হবে উচ্চমানের যুদ্ধবিদ্যা, সর্বদা ভরসা রাখতে হবে মহান রাব্বুল আলামীনের উপর। আল্লাহ আত্মভোলা মানবজাতিকে জিহাদের দায়িত্ব বুঝার ও তা কার্যকরী করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও নাজাত লাভের তৌফিক দিন। আমীন।

সুত্র:১/মুখতাসার যাদুল মা'আদ(ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ:)

২/ ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ (ড: খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.)

৩/ইসলামে জিহাদের বিধান (ড.মুহাম্মদ নজীবুর রহমান)